এই সপত্নী ছিল কালুর উপেক্ষিতা। সে এই সুযোগে শুনাইয়া দিল: 'মোর গায়ে উড়ে খড়ি তোর গায়ে চুয়া/দাসীতে যোগায় পান গালে গোটা গুয়া॥' এই একটি মাত্র কথায় কবি বাঙালি সংসারের একটি অনবদ্য চিত্র আঁকিয়াছেন। দ্বিতীয়টি হইল কর্পূরের চরিত্র। এই ভীরু বাঙালির চরিত্রটি একঘেয়ে বীররসাত্মক ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে একটি বিপরীতধর্মী সৃষ্টি। বীর লাউসেনের পার্শ্বে এই ভীরু বাঙালির চরিত্রটি অঙ্কিত করিয়া ধর্মমঙ্গলের কবিগণ দুইটি চরিত্রকেই পরস্পরের সান্নিধ্যে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পরিয়াছেন। লাউসেন ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদর্শ সৃষ্টি, কিন্তু কর্পূরই একমাত্র বাস্তব সৃষ্টি। ঘনরামের সামাজিক চরিত্রসৃষ্টিতে কপূরই সুসঙ্গত সৌন্দর্যে মণ্ডিত।

"বহু বাঙলা প্রবচনকে ঘনরাম নিজের কাব্যমধ্যে যেমন স্থান দিয়াছেন, তেমনই তাঁহার নিজের রচিত বহু পদও বাংলা প্রবচনে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই বিষয়ে তিনি ভারতচন্দ্রেরই অনুরূপ। ইহা ব্যতীত অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীতে তাঁহার কাব্য পরিপূর্ণ।

"ঘনরামের কাব্যে কেহ কেহ করুণরসের অভাব বোধ করিয়াছেন। অবশ্য প্রাচীন বাঙলা কাব্যে করুণরস বলিতে যাহা বুঝায় অর্থাৎ নাচাড়ীছন্দে দীর্ঘ বিলাপোক্তি, তাহা ঘনরামের কাব্যে একেবারেই নাই। বিলাপ করিবার চরিত্রগুলি অর্থাৎ স্ত্রী-চরিত্রগুলি ধর্মমঙ্গলকাব্যে পুরুষের অপেক্ষাও বীর, সম্মুখ যুদ্ধে সর্বত্রই তাহারা সশস্ত্র অগ্রসর হইয়া যায়; অতএব ধর্মমঙ্গলে গতানুগতিক করুণরস সৃষ্টির অবকাশ নাই। ধর্মমঙ্গলের কোন কবিই মানবিকতাকে ভিত্তি করিয়া কাব্য লিখিতে বসেন নাই,— ঘনরামও নহেন। তিনি চরিত্রকেই হৃদয়হীন করিয়াও চিত্রিত করেন নাই। প্রাচীন বঙ্গের জাতীয় চরিত্রের ইহাতে আর একটি স্বতন্ত্র এবং পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব তাঁহার মধ্যে যে কোন বস্তুর অভাব আছে তাহাও বলা যায় না।"

২. ধর্মমঙ্গল :

২.ক. ঘনরাম চক্রবর্তী : বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশ রাঢ়ের নিজস্ব গ্রামদেবতা হলেন ধর্মঠাকুর। এই ধর্মকে নিয়ে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যও রাঢ়ের নিজস্ব আঞ্চলিক কাব্য। মনসা বা চণ্ডীমঙ্গলের তুলনায় এই কাব্য অর্বাচীন এবং পশ্চিমবঙ্গের এক সীমাবদ্ধ এলাকায় এর প্রচার। এমন যে ধর্মমঙ্গল কাব্য তার উল্লেখযোগ্য কবি হলেন ঘনরাম চক্রবর্তী। এঁর কাব্য আকারে সুবৃহৎ এবং ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে কবি তাঁর গ্রন্থ সমাপন করেন।

কবির জন্মস্থান হলো কৃষ্ণপুর গ্রাম, পরগণা কইয়ড় এবং জেলা বর্ধমান। তাঁর পিতা গৌরীকান্ত এবং মাতা 'মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা'। কবির চার পুত্র রামপ্রিয়, রামগোপাল, রামগোবিন্দ এবং রামকৃষ্ণ। যে-কোন কারণেই হোক কবি বর্ধমানের অধিপতি কীর্তিচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন তাই কাব্য-মধ্যে তাঁরও কল্যাণ কামনা করা হয়েছে। এ-ছাড়াও কবি তাঁর টোলের অধ্যাপকের কথা বারে বারে অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে এখানে স্মরণ করেছেন, গুরুপদে একান্তভাবে শরণ নিয়েছেন।

ঘনরামের কাব্যবৈশিষ্ট্য এবং তাঁর কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে বাঙলা মঙ্গলকাব্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঐতিহাসিক যে পর্যালোচনা করেছেন আমরা এখানে তা প্রায় সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃতি করবো। তিনি লিখেছেন: "ঘনরামের কাব্য-রচনায় দেবতার স্বপ্নাদেশের কোন উল্লেখ নাই। এখানে গুরুর আদেশই দেবতার স্বপ্নাদেশের কার্য করিয়াছে। এই গুরুই তাঁহাকে কবিরত্ন উপাধিতে ভূষিত করেন— ইহা তাঁহার রাজদত্ত উপাধি নয়। ঘনরাম শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন,— সেইজন্য তাঁহার লাউসেনের চরিত্রাঙ্কনেও শ্রীরামচন্দ্রের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। ঘনরাম বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা করিতেন, তদুপরি তাঁহার পরবর্তী জীবনে সঞ্চিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান তাঁহার স্বভাব-কবিত্বের উপর পাণ্ডিত্যের প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছে,— এই-ই তাঁর কাব্যের বিশিষ্টতার দ্যোতক।..... এই বিষয়ে একমাত্র তাঁহার পরবর্তী কবি ভারতচন্দ্রের সহিতই তাঁহার তুলনা হইতে পারে।..... ঘনরামের ভাষা অত্যন্ত মার্জিত এবং উন্নত রুচির পরিচায়ক। যথাযথ অনুপ্রাস-প্রয়োগ তাঁহার রচনাকে শ্রুতিমধুর করিয়াছে। ইহা ছাড়াও প্রবচনের মতো সংক্ষিপ্ত কথায় গভীর ভাব প্রকাশ করিতে ভারতচন্দ্রের তিনি পূর্বসূরী। তাঁর রচনার আপেক্ষিক অপ্রচলন ঘটলেও ঘনরামই এই ধরনের রচনার পথপ্রদর্শক।

"মৌলিকতাহীন ও গতানুগতিক কাহিনীর মধ্যেও ঘনরাম কয়েকটি চরিত্রসৃষ্টিতে বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমটি হইল লখাইয়ের সপত্নী সনকা। শত্রু আসিয়া নগর আক্রমণ করিলে লখাই তাহার সপত্নীর নিকট নগর রক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু